যেখানে যুদ্ধ সেখানেই ছুটে গিয়েছি মানবিক সাহায্য নিয়ে

লেখক: ড. মারুফ উল ইসলাম | প্রকাশিত: 13 September 2026, 11:05 AM | বিভাগ: এইচআরএম

আমার জন্ম কসবায়। এটি খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় অবস্থিত। শৈশবের পড়ালেখা সেখানেই। স্কুল জীবনের সবটুকুই কেটেছে ওখানে। তারপর আজম খান কমার্স কলেজে। আমরা যখন পড়ালেখা করছি তখন বিজ্ঞান পড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার মধ্যে সেটা তেমন তীব্র ছিল না। এর পেছনে একাধিক কারণ ছিল। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আমার কাছে কিছুটা জটিল মনে হতো। তাছাড়া আমার খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমি বহুবার দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। মূলত তখন থেকেই আমার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা জেগে উঠে যা পরবর্তীকালে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দারুণভাবে সহায়তা করেছে। বিজ্ঞান আর খেলাধুলা এ দুটি একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। তাই বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে আমি তৎকালীন কমার্স নিয়ে পড়তে উদ্যোগী হই এবং ম্যানেজমেন্টে উচ্চশিক্ষা লাভ করি। পরবর্তী পর্যায়ে ডক্টরেট

ডিগ্রি অর্জন করি।

১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বের মাসে আমি কেয়ার ইন্টারন্যাশনালে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি। কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল তখন এমন কিছু উচ্চশিক্ষিত তরুণকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিল যাঁরা নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারবে। কেয়ারে যোগদানের পর আমার কাছে মনে হলো এটি একটি নতুন জগত। আমি সচরাচর যে পরিবেশ ও সংস্কৃতি দেখে এসেছি তার সাথে এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য অনেক বেশি। বিশেষকরে অফিস কালচার এবং ডিসিপ্লিন। ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে আমার একটি সুবিধা ছিল আমি যে পরিবারে বেড়ে উঠেছি সেখানে আমাকে বেশ কঠিন ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয়েছে। তাছাড়া খেলাধুলা করতাম বিধায় সেখানেও আমাকে সবসময় এটি মেনে চলতে হতো। ফলে ডিসিপ্লিন নিয়ে আমাকে তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। তথাপি আমার কাছে মনে হয়েছে এটি একটি কঠিন জায়গা। পথচলা সহজ হবে না।

অফিসে যোগদান করার পর প্রথমেই আমাকে দুটি নির্দেশ শুনতে হয়েছিল। এর একটি ছিল ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলা যাবে না। মৌখিক বা লিখিত যে কোনো প্রকার কমিউনিকেশন ইংরেজিতে করতে হবে। এমনকি নিজ দেশের মানুষের সাথেও। আরেকটি হলো কোনো মিটিং যদি নয়টায় হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই পৌনে নয়টায় হাজির থাকতে হবে। বিলম্ব বলতে কোনো কিছু ওখানে ছিল না। দেরিতে মিটিং-এ উপস্থিতির কথা ভাবাও যেত না। এ দুটি বিষয়ের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে পরবর্তী জীবনে আমাকে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়নি। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিল সকলেই বিদেশি। কেউ আমেরিকান, কেউ ব্রিটিনের। আমার সরাসরি বস ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তখন আমার মনে হতো প্রতিদিনই আমি নতুন কিছু শিখছি। কেয়ারের সার্বিক পরিবেশ, ডিসিপ্লিন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার জন্য গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।

কেয়ারে আমার সবসময় স্বপ্ন ছিল নিজেকে আরও ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এ কারণে কাজের প্রতি শতভাগ উজাড় করে দিয়েছিলাম। ১৯৮৩ সালে একটি নতুন আইডিয়া নিয়ে আমার কাজ করার সুযোগ হয়। ওই সময়ে বাংলাদেশে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু ছিল। এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হতো। কিন্তু, রাস্তা নির্মাণই শেষ কথা নয়। তখন আমি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি আইডিয়া দিয়েছিলাম। কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল আমার আইডিয়াটি পছন্দ করে। তারপর রুরাল মেনটেন্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় আমার আইডিয়াটি কাজে লাগানো হয়। আইডিয়াটি নিয়ে প্রথমে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে টাঙ্গাইলের গোপালপুরে একটি প্রকল্প গ্রহণ করি। এই কাজের জন্য আমরা পনেরো জন অসহায় মহিলাকে বাছাই করি। তাঁরা অল্প কাজ করে পারিশ্রমিক পেতে। প্রকল্পটি দারুণভাবে সফল হয়। তারপর সারা দেশে আমরা ৬০ হাজার অসহায় মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় এনেছিলাম। তাঁরা এতোটাই অসহায় ছিল যে ভিক্ষা করে জীবনধারণ করত। আমরা তাঁদের আয়ের পথ তৈরি করে দিয়েছিলাম। তাঁরা ভিক্ষা ছেড়ে দিয়েছিল। এ প্রকল্পটি আমার অভিজ্ঞতাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছিল।

এরপর আমাকে চট্টগ্রাম ডিভিশিনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এটি ছিল আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, চট্টগ্রাম ধনী এলাকা। মানুষ ধর্মপরায়ন। ১৯৮৪ সালে মহিলারা রাস্তায় এসে কাজ করবে তা চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু সেখানেও সফল হয়েছি। এরপর আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। হেড অব অপারেশনস পদে আমাকে উন্নীত করা হয়। ওই সময় এটাই ছিল বাংলাদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ পদ। আমার অধীনে ছিল ২০টি সাব অফিস। তখন আমার বয়স ত্রিশের নিচে। এই পদটি আমার মনে আরও বড় পরিসরে কাজ করার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। কেয়ার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু জাতিসংঘ আরও বড়। স্বপ্ন দেখতে শুরু করি সেখানে কাজ করার।

(চলবে)

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।